রক্তের
মধ্যে
বিষ
অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম প্রকাশ

শারদীয়া ১৩৯৪
কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রযোজনা
খেলাধুলো

পরিকল্পনা সুজিত কুন্ডু
রূপায়ন স্নেহময় বিশ্বাস

এক ঃ অমানুষের আবির্ভাব

'আজ্ঞে না, আমি ভূত নই।'

'তবে তুমি কে?'

'অমানুষ।'

'সে তো আরও ভয়ংকর। ভূত নও, প্রেত নও, মানুষ নও,—অমানুষ। দেখতেও তোমাকে

অতি বিকট। বৎস আগন্তুক, তোমার আগমনের অভিপ্রায় ?'

'সেটা বলতেই এসেছি।'

'বলে ফেললেই হয়। এত ধানাই পানাই কেন ?'

'আমার চেহারাটা দেখে আঁৎকে উঠলেন কেন ?'

'মূর্খ! প্রফেসর নাট বল্টু চক্র কাউকে দেখে আঁৎকায় না। আমি অবাক হয়েছিলাম। ঐ তো দীননাথ সব শুনছে। ওকেই জিজ্ঞেস করো না।'

লোকটা এতক্ষণ টুলে বসেছিল। প্রফেসর ওর সামনের চেয়ারে বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দন্তহীন মাড়িতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে কথা বলছিলেন। আমি চৌকাঠ পেরিয়েই থমকে গেছিলাম তার চকচকে মাথা দেখে। মানুষের মাথায় সচরাচর টাক পড়ে সামনে, পেছন দিকে কিছু না কিছু চুল থাকে। এর পেছনটা বিলকুল চকচকে। গায়ে জামাকাপড়ের বালাই নেই। ইলেকট্রিক বাল্ব-এর আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার চকচকে গা থেকে। কারণ, গায়ে সাজানো রয়েছে বড় বড় আঁশ। মাছের গায়ের আঁশের মত। পিঠের দুপাশে ফুলে রয়েছে। দুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে সেখানে। সবুজ শ্যাওলা জমেছে সর্বাঙ্গে। তবুও চকচক করছে ধাতু।

তার গা থেকে জল পড়ছে। মেঝে ভিজে গেছে। ঐ জন্যেই নিশ্চয় চেয়ারে বসতে দেননি—টুলে বসিয়েছেন।

প্রফেসর যখন বললেন 'ঐ তো দীননাথ সব শুনছে। ওকেই জিজ্ঞেস করো না।—তখন তার উচিত ছিল সবেগে ঘুরে বসা, অথবা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠা।

কিন্তু সে এ সবের ধার দিয়েও গেল না। পিঠ খাড়া করে যেমন বসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল।

বলল—'আমি দেখেছি।'

প্রফেসর মাড়িতে সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ করলেন। দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চোখ কুঁচকে আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন—'কি করে দেখলে ?'

'আমার মাথার পেছন দিকেও একটা চোখ আছে।'

'তোবা! তোবা! মাথার সামনে একটা চোখ—মাছের চোখের মত। পেছনেও একটা চোখ। তুমি তো ভয়ঙ্কর অমানুষ হে।'

এতক্ষণে আমার নজরে এল চোখটা। ঘরের আলো সামনের দিক থেকে লোকটার মুখে পড়ছিল, ওপরেও একটা আলো জ্বলছিল। কিন্তু টেকো মাথার—পেছন দিকটা ঢিবি হয়ে থাকায় তলার খোঁদলে কি আছে দেখা যাচ্ছিল না।

এবার ঠাহর করতেই দেখতে পেলাম চক্ষু-রত্নটিকে। রত্ন ছাড়া তাকে আর কি বলব? বিলকুল গোল। যেন একটা কাটাই করা দামী পাথর সেট করা রয়েছে খোঁদলের মধ্যে।

সে চোখে পাতা নেই। মাছের চোখেও পাতা থাকে না।

নির্ণিমেষে অমানুষিক চাহনি মেলে রয়েছে সেই চক্ষু—আমার দিকেই।

গা শির শির করে উঠেছিল আমার। নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম আমি।

প্রফেসরের কিন্তু ভয়ডর নেই। বরং বিলক্ষণ কৌতুকেই আছেন মনে হল। ফিক করে একটু হেসেও ফেললেন।

বললেন—'বাপু হে অমানুষ, এসেছি দীঘায় বেড়াতে—তোমার কেচ্ছা শুনতে নয়। তোমার বদখৎ মুখ আর বপু দেখে আমার গুণধর অ্যাসিস্ট্যান্টটি ভয় পেয়েছে। তোমার সামনে একটা চোখ, পেছনে একটা চোখ। তোমার মাথায় চুল নেই, গায়ে লোম নেই—শুধু আঁশ আর আঁশ। তোমার সারা গা দিয়ে জল ঝরছে, তোমার গা থেকে বিচ্ছিরি গন্ধও বেরোচ্ছে।

কাজেই তুমি চটপট বিদেয় হলে আমি বড়ই খুশি হব।'

লোকটা কথা বলছিল খুব কষ্ট করে। এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। হাপর চালালে যেমন সোঁ-সোঁ শব্দ হয়, ঠিক তেমনি শব্দ হচ্ছিল। টুলের ওপর স্ট্যাচুর মত বসে থেকে সে শুধু বললে—'আমার কথা না শুনলে আপনাদের অবস্থা হবে আরও শোচনীয়।'

প্রফেসর একটু নড়েচড়ে বসলেন,—'আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

জবাব দিল না কিম্ভূত লোকটা। কেটে গেল কয়েকটা সেকেণ্ড। পেছন থেকে আমি দেখলাম ঝকঝকে পাথরের মত চোখটায় যেন রঙ বেরঙের আলোর আনাগোনা দেখা গেল। তারপর সব রঙ আবার মিলিয়ে গেল।

প্রফেসরও চেয়েছিলেন সামনের দিকের চোখের পানে। বিস্ফারিত দুই চোখে ঘনীভূত বিস্ময় দেখে বুঝলাম, ওই চোখেও আলোর ঝলক তিনি দেখেছেন।

বললেন—'সংকেত এল মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এল।'

'এত আলোর খেলা দেখিয়ে কারা সংকেত পাঠাচ্ছে?'

'এখুনি শুনবেন।'

'কি বলবে, তা জানিয়ে দেওয়া হল?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো কিন্তু বলোনি নিবাস কোথায় তোমার।'

'নিজের চোখেই দেখবেন, তাই আর বলতে চাই না।'

'তুমি কথা বলছ ঠিক মেশিনের মত গলায়। স্বরের ওঠানামা নেই। যেমনি বিচ্ছিরি তোমার কথা, তেমনি বিটকেল তোমার চেহারা, তেমনি কদাকার তোমার চোখ। হে অমানুষ, তোমার শ্রীনিবাস দেখবার কোনও বাসনা আমার নেই। আমার ঘুম পেয়েছে, আসতে পারো।'

লোকটা এবার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। রুপোলী আঁশগুলো ঝকঝক করে উঠলো বিদ্যুৎবাতির আলোয়।

যান্ত্রিক স্বরে সে বলে—'সংকেতেই হুকুম এল, আপনাদের নিয়ে যেতে। যাওয়ার দরকার হত না যদি আমাকে কথা বলতে দিতেন।'

প্রফেসরও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'যত্তো সব আপদ! দূর হও এখুনি।'

লোকটার মাথার পেছনে পাথরের মত চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে এল। চকিতের জন্যে দেখলাম, তার মাথার সামনের দিকের চোখ থেকেও বিদ্যুৎ-রশ্মি ঠিকরে গেছে প্রফেসরকে নিশানা করে। তীব্র ঝলকে উদ্ভাসিত তাঁর মুখমণ্ডল। দুই বিস্ফারিত চোখে সুনিবিড় বিস্ময়বোধ। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই—শুধু বিস্ময়।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

দুই: মেসিন-সম্রাটের খপ্পরে

এরপর মনে আছে আচ্ছন্নের মত হেঁটে যাচ্ছি দীঘার সমুদ্রের দিকে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছি আমি আর প্রফেসর। সামনে কিছু দূরে চলেছে সারা গায়ে আঁশঢাকা বিচিত্র সেই অমানুষ। সে পেছন দিকে ঘাড় না ঘুরিয়েও পেছনে আমাদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছে পেছনের চোখ দিয়ে।

আমরা হাঁটছি যেন ঘুমের ঘোরে। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছি ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মুকুট, শুনছি চাঁদের মৌন সঙ্গীত। আমার প্রাণে শঙ্কা নেই, মনে কৌতূহল নেই, কোথায় চলেছি তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই। কেন যাচ্ছি, তাও জানি না। শুধু যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

অমানুষ নেমে গেল জলের মধ্যে। আরও গভীরে। অনেকদূরে তার চকচকে টাক মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাচ্ছে। সে কিন্তু এখনও ঘাড় ঘোরায়নি।

আমরাও সম্মোহিতের মত জলে নেমেছি। শীতল জল আমাদের মোহভঙ্গ ঘটায়নি। বরং ভালই লাগছে। স্বপ্নের মধ্যে এরকম ভাললাগা অনুভূতি অনেক সময় হয়। আমরাও বুঝি স্বপ্ন দেখছি।

জল কোমর ছাড়িয়ে গলা পর্যন্ত পৌঁছলো। ঢেউ আমাদের টলিয়ে দিচ্ছে। তবুও এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায়? কেন? জানি না।

দূরে চাঁদের আলোয় ধোওয়া অমানুষের অমানুষিক মাথা ল্যাম্পপোস্টের মত খাড়া। লাইটহাউসও বলা চলে। কেননা, সামনের পাথরের চোখ থেকে মাঝে মাঝে সার্চ-লাইট ঠিকরে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে। আলোক সংকেত নিঃসন্দেহ। তার নমুনাও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেইখানে অনুরূপ সার্চলাইটের ঝলক দেখলাম একবার…দুবার…তিনবার। তারপরেই তা নিভে গেল।

আমরা জল ঠেলে ঠেলে যখন অমানুষের ঠিক পেছনে পেঁছেছি, আচমকা ভু-উ-উ-স করে একটা জলযান ভেসে উঠল আমাদের পাশেই।

আমরা দুজনে কেউই অবাক হলাম না।

শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আজব জলযানকে। স্পীডবোটের মতন দেখতে। মাথায় কিন্তু ছাউনি। সব মিলিয়ে যেন একটা ডাংগুলির গুলি। লম্বায় প্রায় পনেরো ফুট। সারা গায়ে চকচকে ধাতব আঁশ।

নিঃশব্দে একটা প্লেট সরে গেল জলযানের গা থেকে। আমাদের কিছু বলতে হল না। সুবোধ বালকের মত প্রথমে আমি ঢুকলাম ভেতরে। তারপর টেনে নিলাম প্রফেসরকে।

প্লেট সরে এল। এবার আর তা ধাতুর নয়। কাঁচের

মত স্বচ্ছ পদার্থের। আমরা দেখলাম নিমেষে সমুদ্রের জল ঢেকে দিল সেই জানলাকে। বুঝলাম, জলে ডুব দিল যন্ত্রযান।

জলের তলায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জোরালো আলোয়। এ আলো বেরোচ্ছে ডুবো যানের গা থেকে। তীব্র বেগে ছুটছে যন্ত্রযান। ভয়ানক সেই বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অক্লেশে ধেয়ে চলেছে অমানুষ—স্বচ্ছ জানলার ঠিক পাশে পাশে। সাঁতার কাটছে না। দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে। পিঠের দুটো ফুটোর কাছে শুধু জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম, প্রচণ্ড শক্তির প্রবাহ বেরিয়ে আসছে ঐ দুটি ছিদ্র থেকে। তারই ধাক্কায় জীবন্ত জেটযানের মত বেগে ধেয়ে চলেছে অমানুষ।

নিরাসক্ত চোখে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নরম গদীর ওপর।

ঘুম ভাঙল দুজনের একসঙ্গেই।

সামনের প্লেট খোলা। গদীর বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম দুজনে।

দেখেছিলাম, ডুবোযান এখন মেঝের ওপর উঠে এসেছে। জল নেই আশেপাশে কোথাও!

মেঝেটাও অদ্ভুত। সিমেণ্টের বা পাথরের নয়—ধাতুর। ধাতুর চাদর জুড়ে জুড়ে তৈরি মসৃণ মেঝে। তার গায়ে অজস্র নকশা। উদ্ভট। হেঁয়ালীপূর্ণ।

আশ্চর্য এই মেঝে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। শেষ দেখা যাচ্ছে না। অনেক উঁচুতে একটা ছাদ আছে বটে, কিন্তু তা এত উঁচুতে যে, তা কি দিয়ে তৈরি বোঝা যাচ্ছে না।

সীমাহীন প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা তিনজন। আমি, প্রফেসর আর অমানুষ। আর সেই জলযান।

সমস্ত প্রান্তর ঠাণ্ডা আলোয় আলোকিত। এ আলো কোত্থেকে আসছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

আমার এবং প্রফেসরের আগের ঘুম-ঘুম ভাবটা এখন আর নেই। যেন ঘুম ভাঙল। স্বপ্ন দেখা শেষ হল।

দেখলাম, রুষ্ট নয়নে অমানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর। কথা বলতে গেলেন বেশ কড়াভাবে, তার আগেই সবুজ রশ্মির ঝলক দেখলাম তার একটা পাথরের চোখে।

রশ্মিরেখা জলযানকে স্পর্শ করল। তলার মেঝে নিঃশব্দে সরে গেল। জলযান গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে গেল। মেঝে আবার সরে এল। এতটুকু ফাঁক আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এখন আমরা শুধু তিনজন। অমানুষ ভয়ানক পাথর-চোখ মেলে দেখছে আমাদের।

তিরিক্ষে গলায় প্রফেসর বললেন—'কিডন্যাপিং-এর মজা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব বাছাধন।'

অমনি আশপাশের বাতাস থর থর করে কেঁপে উঠল একটা ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য সুরেলা সেই গলার আওয়াজ গমগম করতে করতে মাঝের ধাতুর চাদরের ওপর দিয়ে মিলিয়ে গেল দূরে···দূরে··· অনেক দূরে।

কণ্ঠস্বর বললে—'প্রফেসর, ওর গায়ে হাড় নেই।'

'কার কণ্ঠস্বর?' আশপাশে চাইতে চাইতে বললেন প্রফেসর—যেন নাটকের সংলাপ বলছেন।

'আমার।'

'তুমি কে হে ছোকরা?'

ছোকরা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 'অট্টহাসি যে এরকম বজ্রগর্ভ নিনাদিত হতে পারে, সেদিন তা বুঝলাম। ধাতুর মেঝে পর্যন্ত বুঝি ঝনঝন করে কেঁপে উঠল বিশাল আওয়াজের সেই অট্টহাসিতে। 'প্রফেসার নাট বল্টু চক্র, আমি ছোকরা নই, বৃদ্ধ নই, শিশু নই। আমার বয়স নেই।'

'তবে তুমি পাগল।'

'সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝবেন এখুনি। আপনাদের হাড় আছে বলেই বুঝবেন। ওর কিন্তু নেই।

'মানে ওই অমানুষটার?'

'অমানুষ তো বটেই। প্রায় মানুষের মতই। কিন্তু আদতে একটা মেশিন। আমার নাম্বার ওয়ান সুপার কমপিউটার। সিলিকন-চিপ দিয়ে তৈরি।'

'সেইরকম সন্দেহ ছিল আমার। চোখের পাথরটা যে লেন্স আর বডিটা যে মেট্যালের— তা বুঝেছিলাম প্রথম দর্শনেই।'

'সেটা বোঝবার বুদ্ধি আছে বলেই আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। এখন কাজের কথা।'

'কান খাড়া করলাম, মেশিন-সম্রাট।'

মেশিন-সম্রাট? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!'

অট্টহাসির দমকেই কিনা জানি না, আওয়াজের ধাক্কায় বাতাসের আলোড়নের জন্যেই কিনা বলতে পারব না—অকস্মাৎ বিকট হুংকারে ভয়াবহ ঝড় তেড়ে এল দৃশ্যমান অদৃশ্যলোক থেকে। মসৃণ মেঝেতে আমরা কিছুই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলাম না।

ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল শূন্য পথে।

পাকসাট খেতে খেতে উড়ে যেতে যেতে দেখলাম, ধাতুর মেঝেতে নিশ্চয় চুম্বকের পা লাগিয়ে স্ট্যাচুর মত খাড়া রয়েছে অমানুষ।

তিন : বরফলোকের বিভীষিকা

কত দিন, কত মাস, কত বছর না জানি শূন্যপথে ডিগবাজি খেতে খেতে এইভাবে উড়ে গেছিলাম। হিসেব? মনে রাখা অসম্ভব। সময় কি হারিয়ে গেছিল। হয়তো

সম্ভব। হুঁশ ছিল কি! কখনো ছিল, কখনো ছিল না। কখনো অনেক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখেছি। কখনো তাল তাল তমিস্রাপুঞ্জ দৃষ্টিপথকে রোধ করেছে। কখনো অকথ্য যন্ত্রণায় মগজের ষাট মহাপদ্ম স্নায়ুকোষ মৌন আর্তনাদ করেছে। কখনো তারা সুপ্তি আর লুপ্তির টানাপোড়েনে ঘোরের মধ্যে চলেছে।

আমরা দেখেছি হাজার রঙের স্রোত আশপাশ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। আমরা দেখেছি এই স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে অকস্মাৎ এনার্জির বিস্ফোরণে সব রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে দিকে দিকে সোনা রুপো হীরেমানিক চুনি পান্নার অজস্র কুচির মত। আমরা দেখেছি কী এক মহাশক্তির অবর্ণনীয় আকর্ষণে অকস্মাৎ আমাদের দেহ মাইলব্যাপী লম্বা হয়ে গেছে—সরু সুতোর মত দেহ নিয়ে আমি আর প্রফেসর পাশাপাশি অনেক ব্ল্যাক হোল-এর মত এনার্জিপুঞ্জকে এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে ধেয়ে চলেছি তো চলেইছি। বিস্ময়কর এবং অতীব অবিশ্বাস্য এই মহাযাত্রার শেষ কোথায়, অন্তে কি পরিণতি অপেক্ষা করছে, অদৃষ্টে কি আছে—তা নিয়ে একবারও ভাবিনি··· ভাববার অবকাশ পাইনি।

সবচেয়ে অবাক কথা এবং অসহ্য অবস্থাও বটে, কানের কাছে বিরামহীনভাবে নিনাদিত হয়ে চলেছিল সেই অপার্থিব অট্টহাসি। ভয়ানক গম্ভীর, আশ্চর্য সুরেলা এবং বিকট করাল কণ্ঠস্বরে অনেক কথাও শুনিয়ে গেছে অট্টহাসির ফাঁকে ফাঁকে। সব কথা মনে নেই প্রাণান্তকর ঐ অবস্থায়। কতগুলো কথা একেবারেই গেঁথে গেছে মগজের কোষে কোষে।

'প্রফেসর! মাস্টার দীননাথ! আমার রাজত্বর কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি।···না, না, এগুলো নিছক রঙের স্রোত নয়—এরা আমারই যন্ত্রপাতির বিকিরণের প্রবাহ। ঐ যে বিস্ফোরণটা দেখে আঁতকে উঠলেন—ওই থেকেই শক্তি ছুটে যাচ্ছে আমার সাম্রাজ্যের দিকে দিকে। ও রকম বিস্ফোরণ মাঝে মধ্যেই দেখবেন। শক্তি! শক্তি! শক্তি! মহাশক্তিদের খেলা চলছে এখানে—আমারই হুকুমে ·· আমারই পরিকল্পনায়। আমি কে? যথাসময়ে তা জানবেন। এসে গেল আমার অগুন্তি কারখানার একটা কারখানা···কেল্লায় ঢুকতে হলে আপনাদের শরীরগুলোকে সরু করে নিতে হবে···তাই করে দিচ্ছি·· সুতোর মত সরু··· মাইলখানেক লম্বা · কি রকম লাগছে প্রফেসর মশাই? মাস্টার দীননাথ। এসে গেছে কারখানা···এইবার ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেহ।'

আচম্বিতে এক ঝটকায় ফিরে এল আমাদের আগেকার অবস্থা। হাড়মাস যেন ক'কিয়ে উঠল সেই ঝটকানিতে।

আমরা দেখেছি হাজার রঙের স্রোত আশপাশ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে।

...া তুলোর মত আমরা ভাসতে লাগলাম শূন্যে। ...নকনে ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম ঠক্‌ঠক্‌ করে।

কেননা, পায়ের তলায় দেখলাম ধূ-ধূ বরফের রাজত্ব। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে—যেদিকে তাকাই শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও তা পাহাড়ের মত উঁচু, কোথাও তা সমতলের পর্যায়ে। দিগন্ত বিস্তৃত এই বরফলোকের ওপর জায়গায় জায়গায় ভাসছে লাল নীল সবুজ হলদে বেগুনী কমলা রঙের মেঘ আর কুয়াশা। নরম আলোর ঝিকিমিকি লক্ষ নক্ষত্র হয়ে যেন ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে এদের গা থেকে, বরফের বুক থেকে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে যখন এই দৃশ্য আমরা দেখছি, ঠিক তখনি নিচ থেকে দু-দুটো রশ্মি ধেয়ে এলো আমাদের লক্ষ্য করে। কচি কলাপাতা রঙের ঠাণ্ডা রশ্মি জড়িয়ে গেল আমাদের সর্বাঙ্গে। যেন কোমল পরিচ্ছদে আবৃত হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

তারপর সেই রশ্মি আমাদের একটু একটু করে টেনে নামিয়ে আনল মেঝেতে।

না। এখানকার মেঝে ধাতু দিয়ে তৈরি নয়—বরফে ঢাকা। এবং আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে সেই অমানুষ—যার সারা গা আঁশে ঢাকা, যার পাথর চোখে এইমাত্র ঢুকে গেল রশ্মি দুটো আমাদের ওপর থেকে নিচে টেনে নামিয়ে আনবার পর।

রশ্মি এখন আর আমাদের জড়িয়ে নেই। আমরা হাত-পা নাড়তে পারছি। চোয়াল নাড়তেও পারছি।

সুতরাং প্রথমেই দাবড়ানি দিলেন প্রফেসর—'বেল্লিক বেকুব কোথাকার! আমরা মানুষ না অমানুষ?'

'মানুষ'—সংক্ষিপ্ত উত্তর অমানুষের।

প্রফেসর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। একটা তাগড়াই জবাব দিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দূরে চোখ পড়তেই বাকরোধ ঘটল।

আমিও তাকালাম সেদিকে। মনে হল যেন লকলকে শিখা চতুর্দিকে ছড়াতে ছড়াতে একটা ভীমকায় নরকপুঞ্জ উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।

দেখতে দেখতে অনেক কাছে এসে গেল পুঞ্জটা। প্রতিটি শিখা শুঁড়ের মত শূন্যে কিলবিল করে উঠেই আবার ঢুকে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে। রঙবেরঙের ফুলকি ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে শুঁড়গুলোর ডগা থেকে।

'চলমান তারাবাজি নাকি?' অস্ফুট কণ্ঠে বলে ফেললেন প্রফেসর।

আশ্চর্য আতশবাজি নিঃসন্দেহে—বললাম আমি।

কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল সেই অবর্ণনীয় মেঘ-মন্দ্র কণ্ঠস্বর—"মূর্খ! অপটিক্যাল কমপিউটরের নাম শোনেননি?"

জ্বল জ্বল করে তাকালেন প্রফেসর—তা শুনেছি।"

'দেখতে পাচ্ছেন না ওর সারা গায়ে ক্রিস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মি ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

তাও তো বটে! আগুনের ফুলকি বলে যাদের ভেবে-ছিলাম সেগুলো তো ছোট ছোট রশ্মি ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষ রশ্মি লক্ষ ক্রিস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে ছুটোছুটি করছে। লক্ষ রামধনু ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এ যে কল্পনাও করা যায় না।

লক্ষ অর্গ্যান-কণ্ঠে বললে অদৃশ্য সত্তা—"এই হল গিয়ে আমার দোসরা নম্বর সুপার কমপিউটার। এর কাজ শুধু পাহারা দেওয়া—অরগ্যানিক সুপার কমপিউটারকে বাড়তে দেওয়া।"

"অরগ্যানিক সুপার কমপিউটার!" প্রফেসর নাট বল্টু চক্র ঢোঁক গিললেন মনে হল?

দৈববাণীর কণ্ঠস্বরে এবার বুঝি বিদ্রূপ ঝরে পড়ে—জী হ্যাঁ, প্রফেসর। বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিক নিয়েই তো যত খেলা আমার এই সাম্রাজ্যে।"

আমার মাথায় তখন এত কচকচি ঢুকছে না। আমি সভয়ে চেয়ে আছি হাত-চকীবাজির মত কিম্ভূত অপটিক্যাল সুপার কমপিউটারের দিকে। আমি জানি না কথাটির মানে কি, কিন্তু ওই নামের বস্তুটি যে সর্বনাশের সঙ্কেত বহন করে চলেছে প্রতিটি হিদঘুটে আচরণের মধ্যে, সে বিষয়ে নেই কোন সন্দেহ।

অজস্র আকারের এবং অবিশ্বাস্য বর্ণের ক্রিস্ট্যালগুলো এখন অবিরাম রোশনাই বিকিরণ করে চলেছে লক্ষ রশ্মির আঘাতে। আমাকে আর প্রফেসরকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে সে শূন্য পথে। তার সারা গা থেকে মনে হচ্ছিল যেন ফুলকিগুলো ছিটকে ছিটকে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখলাম তা নয়। বাতাসের বুকে বিশেষ প্যাটার্নের নকশা আঁকছে—পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে তারই অবয়বের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে এই অপার্থিব অপটিক্যাল সুপার কমপিউটার। চোখে ধাঁধা লাগছিল বলেই কিনা জানি না, আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে হল লক্ষ ক্রিস্ট্যাল-চক্ষু মেলে ভয়ঙ্কর এই বিভীষিকাটা আমাদের নাড়ি নক্ষত্র পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। আমাদের রক্ত-মেদ-মজ্জার চুল-চেরা হিসেব নিচ্ছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম রিমঝিম মৃদু বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম। সেটাও এই উদ্ভট অপটি-ক্যাল কমপিউটারের কারসাজি কিনা বলতে পারব না।

সহসা উদ্দাম নাচ বন্ধ করে আমাদের ঠিক সামনে সে শূন্যে ভাসতে লাগল। তারপরেই বিশেষ একটা আটকোনা ক্রিস্ট্যাল থেকে একটা আলপিনের মত সরু টকটকে লাল রঙের রশ্মি সাঁৎ করে ছুটে এসে বলা নেই কওয়া নেই ঢুকে গেল প্রফেসরের খুলির মধ্যে।

আমি আঁৎকে উঠে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছি প্রফেসরের দিকে, তার আগেই অমানুষের চোখ থেকে ঠিকরে এল সেই

বিদ্যুৎ রেখা। আমি কাঠের পুতুল হয়ে গেলাম বললেই চলে। ঠিক যেভাবে তেড়ে যেতে যাচ্ছিলাম সেইভাবেই বেঁকে চুরে দাঁড়িয়ে গেলাম—চোখের পাতাও আর ফেলতে পারলাম না।

তাই অসহায়ের মতই দেখলাম কল্পনাতীত সেই দৃশ্য।

সরু আলপিনের মত লাল রশ্মিটা প্রফেসরের করোটির মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন জানি হয়ে গেলেন। শিবনেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তন্ময় হয়ে কি যেন শুনছেন মনে হল। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন দেখলাম। যা শুনছেন, তা কখনও মনে ধরছে না বলে প্রবলবেগে মাথাও ঝাঁকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হাসছেন। পাগল-টাগল হয়ে গেলেন না কি?. লাল রশ্মি কিন্তু তার কপাল ভেদ করে রয়েছে দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে। ছুঁয়ে নেই—ফুঁড়ে রয়েছে। কেননা, মাঝে মাঝে করোটির পেছন দিয়েও লালরশ্মির অগ্রভাগ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—ফের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

কতক্ষণ যে এই দৃশ্য দেখতে হয়েছিল, সে হিসেব আমি বলতে পারব না।

শেষের দিকে আর সইতে পারিনি। চোখে ধোঁয়া দেখেছিলাম। জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

চার : মানুষ না ভূত

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেছিলাম প্রফেসর সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

আমি শুয়ে আছি প্রফেসরের কোলে মাথা দিয়ে। আমার সামনেই মিনারের মত দেখতে অমানুষটা দাঁড়িয়ে পাথরের এক চোখ মেলে দেখছে আমাকে। উল্টো দিকের চোখটার কীর্তিকলাপ দেখতে পেলাম না।

আমি চোখ মেলতেই সে বললে যান্ত্রিক স্বরে—"চলুন।"

ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। প্রফেসর বেগতিক বুঝে আমাকে জাপটে ধরতে গেলেন—কিন্তু পারলেন না। আমি ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া তীরের মত গিয়ে পড়লাম অমানুষের গায়ের ওপর। সে বেচারীর যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতাকে টেক্কা মেরে দিলাম আমার মানুষিক ক্ষিপ্রতা দিয়ে।

লক্ষ্য এবং মতলব স্থির করাই ছিল। সবলে খামচে ধরলাম তার দু-দুটো পাথরের চোখ। নখসমেত আঙুল বসিয়ে দিয়েছিলাম পাথরের কিনারা দিয়ে। তাই এক হ্যাঁচকাতেই সকেট থেকে তুলে এনেছিলাম চোখ দুটোকে।

সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো আর্তনাদে কান ঝালাপালা হয়ে গেছিল আমার আর প্রফেসরের দুজনেরই। বিষম ব্যস্ত হয়ে তড়িঘড়ি আমাকে চেপে ধরে বিদিগিচ্ছিরি চেঁচিয়ে গেছিলেন প্রফেসর—দীননাথ! দীননাথ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

অন্ধ অমানুষের পরিত্রাহি চিৎকার চাপা পড়ে গেছিল রক্ত জল করা দৈববাণীর মত কণ্ঠস্বরে—মাস্টার দীননাথ! মূর্খ দীননাথ! মাথামোটা দীননাথ! ফিরিয়ে দাও ওর চোখ।

গলার শির তুলে চেঁচিয়ে ছিলাম আমি—চোপরাও ভূত কোথাকার! জানিস ক্ষত্রিয় বংশে আমার জন্ম! তোর হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব আমি।"

'দীননাথ! আমি ভূত নই, প্রেত নই, দত্যি নই, দানব নই—আমি মানুষও না—পিশাচও না—আমি···আমি···।

শশব্যস্তে বললেন প্রফেসর—"থাক, থাক, ওকে বলতে হবে না। ছেলেমানুষ! ভয় পাবে।

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে গেল এই কথায়। ছেলেমানুষ! ভয় পাবে! মুচিপাড়ার মিঞা আমি। মাথায় একটু গবেট হলে কি হবে, মরতে ভয় পাই না কস্মিনকালেও। খোদ প্রফেসরকে কতবার বাঁচিয়েছি স্রেফ এই গোঁয়াতুমি দিয়ে, প্রফেসর কি তা ভুলে গেছেন?

তারস্বরে তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। রে রে ভূত সম্রাট, চ্যালার চোখের ম্যাজিক আমার এই হাতের মুঠোয়। দ্যাখ তার কি অবস্থা করি।

কাণ্ডজ্ঞান আগেই হারিয়েছিলাম, নইলে এমন একটা সীন ক্রিয়েট করি ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে। চোখ-দুটো উপড়ে এনে ভাল করেছিলাম কি মন্দ করেছিলাম, সেটা ঘটনাগুলোয় জানা যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন একটা গুখুরির কাজ করে বসলাম, তার জন্যে লজ্জা পাই।

ডান হাতের একটা পাথর আছড়ে ফেলেছিলাম পায়ের কাছে এবং সেটা ছিটকে গড়িয়ে যাওয়ার আগেই জুতো দিয়ে মাড়িয়ে বেশ করে রগড়েছিলাম মেট্যাল মেঝের ওপর।

পরিণামটা এমন ভয়ঙ্কর হবে কে জানত। পাথরের মধ্যে যে এত রশ্মিদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাই বা কে জানত!

নিমেষে ভলকে ভলকে অগ্নিশিখার মত রোশনাই ছিটকে গেল পায়ের তলা দিয়ে রগড়ানো পাথর-চক্ষু থেকে। মাউণ্ট এটনা, ক্রাকাতোয়া, ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত একযোগে শুরু হয়ে গেলেও এমন আলো আর আগুনের প্রলয়ঙ্কর খেলা দেখা যেতো না। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। মাথার মধ্যে মুগুর পড়তে লাগল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম।

আর একটা গুর গুর গুম্ গুম্ শব্দ শুনলাম অনেক দূর থেকে বরফলোককে থর থর কম্পিত করে সেই নৃত্যের তালে তালে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। চারপাশের বরফমুলুকে আচম্বিতে শুরু হয়ে গেল ভয়ানক ঝড়। তুষার-ঝড় কি ভয়ানক সুন্দর হতে পারে, সেই মুহূর্তে তা প্রত্যক্ষ করলাম। ঠাণ্ডা আলোর পাশাপাশি এসে জুটলো

···সকেট থেকে তুলে এনেছিলাম চোখ দুটোকে।

হিম আবছায়া। সেই লোমহর্ষক আবছায়ার মধ্যে কারা যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে মনে হল—রক্ত ছলকানো মৃদঙ্গ-ছন্দের তালে তালে।

আমার কানের কাছে নিনাদিত হল একশটা বাজনার মত অদৃশ্য সত্তার অট্টহাসি—ভূত মনে করেছিলে আমাকে? তাই নয়? দেখো তবে আমার ভূতেদের খেলা। কইরে তোরা! আয়···আয়···নেচে নেচে চলে আয়! দেখিয়ে যা তোদের মূর্তিগুলো!"

হু হুঙ্কার তুষার-ঝড়ের আবছায়া ভেদ করে তারা এগিয়ে এল দলে দলে—সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় কুচকাওয়াজ করে। তাদের প্রত্যেকের ডান পা একই সঙ্গে পড়ছে মেঝেতে একই সঙ্গে এগিয়ে আসছে বা পা। পদভারে মেদিনী কাঁপছে থর থর করে। কনকনে হাওয়ার ঝাপটার পর ঝাপটায় তাদের হিলহিলে দেহগুলো উড়ে যাওয়ার কথা—তারা কিন্তু টলছে না, কাঁপছে না—শুধু এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি আমি। তাদের যে অবয়ব আমি দেখছি তা এতই বিকটাকার যে লোমকুপে লোমকূপে জাগছে বিষম আতঙ্ক। ডাকাবুকো বলে আমার বদনাম আছে—কিন্তু ভূত-কাতর বলেও আমার নামে রটনা আছে। সে রটনা যে মিথ্যে নয়, তা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে।

এরা কারা? এদের কারও চোখ গলে খসে গেছে। কারও নাক আধখানা গলে গেছে, কারও কান-চিবুক-গালেরও সেই অবস্থা। চোখের মণিগুলো পাথরের কিনা বলতে পারব না—কিন্তু সেগুলো যে বিষম অগ্নিময়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

"এরা কারা? এরা কারা? এরা কারা?" উন্মাদের মত চিৎকার করে গেছিলাম তাদের প্রত্যেকের চাহনি আমার দিকে নিবদ্ধ দেখে।

প্রফেসরও আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চেঁচিয়ে গেছিলেন—দীননাথ! দীননাথ! দোহাই তোমার! পাথর দুটো ফিরিয়ে দাও।

ত্রিভুবন কাঁপানো আবার সেই অট্টহাসির সঙ্গে অদৃশ্য কণ্ঠের সংলাপ শুনলাম কানের কাছে—"মানুষ! এরাও

তোমারই মত মানুষ, দীননাথ। কিন্তু বন্দী আমার কারাগারে—এক্সপেরিমেন্টের জন্যে মানুষ চাই—আরও মানুষ চাই! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!"

এরপর কোনও ভদ্রলোকের ছেলে সজ্ঞানে থাকতে পারে না। আমার মত ভীতুর ডিম তো নয়ই।

পাঁচ : কারাগার কাহিনী

ছোট্ট একটা মেট্যাল চেম্বারে জ্ঞান ফিরেছিল আমার। প্রফেসর কটমট করে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে।

ধড়মড় করে উঠে বসতেই বললেন—'গিলে নাও। খাবার পড়ে আছে।'

খিদে সত্যিই পেয়েছিল। বিশেষ করে খাবারের এত আয়োজন থাকলে কার না খেতে ইচ্ছে যায়। এই একটি ব্যাপারের ওপর কখনও রাগ দেখাই না আমি।

প্রফেসরের কটমটে চাহনি উপেক্ষা করে তাই আমি গোগ্রাসে শেষ করলাম বারকোষের সাইজের বিশাল ধাতুর থালায় সাজানো মাছ আর মাংস, পোলাও আর তন্দুরি, দই আর রাবড়ি। কোত্থেকে এল এত খাবার, ভূতেদের পাচকের হাতে ভৌতিক প্রক্রিয়ায় রান্না করা কি না - সে সব বিষয়ে উচ্চবাচ্যও করলাম না। যে বিকট দৃশ্যটা দেখেছি জ্ঞান লোপ পাওয়ার আগে, তার শিরশিরে অনুভূতির রেশ যে যায় নি তখনও মন থেকে।

পাথরের চোখ দুটো যে আর আমার জিম্মায় নেই সেটা আগেই দেখা হয়ে গেছিল।

খেয়ে দেয়ে ঢক ঢক করে জল খেয়ে ঢেকুর তুললাম বেশ আওয়াজ করেই এবং সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম প্রফেসরকে—'আমরা এখন কোথায়?'

'গোল্লায়!' বললাম নিরীহ মুখে। 'জন্মে এরকম ঘর দেখিনি। গোল বলের মত ঘর কখনো হয়?'

'তোমার মত স্টুপিডদের জন্যে হয়। হাঁদারাম গাধা কোথাকার! কার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছ জানো?'

'জানবার অবকাশ পেলে জানতাম বই কি', ইচ্ছে করেই বললাম প্রফেসর যাতে রেগে যান।

রেগে টং হলেন উনি ঠিকই। কিন্তু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জবাবটা দিতে যাওয়ার আগেই আমি ছিটকে গড়িয়ে গেলাম মেঝের ওপর দিয়ে—থালা বাসনের ঝনঝনানি চাপা পড়ে গেল কৌতুকতরল হাসির শব্দে।

তারই হাসি। যাকে দেখা যায় না। কিন্তু সর্বত্র যে বিরাজমান অদৃশ্য অবস্থায়।

'মাস্টার দীননাথ! মাস্টার দীননাথ! ভূতের খেলা লাগল কেমন? খানা পিনা?'

অমনি চণ্ডালের রাগ চেপে বসল মাথায়। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুসি পাকিয়ে বললাম বাজখাঁই গলায়—'একবার দেখা দিলেই দেখিয়ে দিতাম লাগল কেমন।'

আবার সেই অস্ফুট হাসি। একই গলায় কত সুরই শোনাতে পারে রহস্যময় এই সত্তা।

বললে—'গোলা কিন্তু ছুটছে—না, না, গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে না—চলেছে গভীর সমুদ্রে।'

খাবি খেলাম আমি। আমরা কি তাহলে ধাবমান গোলার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছি? প্রফেসরও ছিটকে গেছিলেন আচমকা ধাক্কায়। কোমরে লেগেছে নিশ্চয়। কোমর টিপে ধরে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

জলনির্ঘোষ তাই কি শোনা যাচ্ছে? ছলছলাৎ শব্দ যদি দ্রুত পরম্পরায় অবিরাম হয়ে যেতে থাকে, তাহলেই সম্ভব এমনি নির্ঘোষ। জলপ্রপাতের মত কানে তালা লাগানো।

সহসা গোলা-ঘরের ঠাণ্ডা আলো নিভে গেল দপ করে। ধাতুর দেওয়ালে জেগে উঠল সার বন্দী পোর্ট হোল। দিনের আলো দেখলাম, দেখলাম নীল আকাশ আর ধু-ধু সমুদ্র।

আর কি দেখলাম? অগুন্তি ডলফিন সাঁতার কাটছে। ছুটছে···কখনও বিশাল ঢেউ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে···কখনও দুই বিশাল ঢেউয়ের মধ্যবর্তী শূন্যতা পাখির মত পেরিয়ে যাচ্ছে। এ কী জলযান? না, উড়ুক্কু যান? এত ডলফিনই বা এল কোত্থেকে?

শেষ প্রশ্নের জবাবটা পেলাম রহস্যময় সেই কণ্ঠস্বরে—মাস্টার দীননাথ, তুমি কি জানো না, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেভাবে অ্যাকুয়ারিয়ামে রঙিন মাছ পোষে, সেইভাবে সমুদ্রে বিশাল ওস্যানারিয়াম আর ডলফিনারিয়াম বানিয়ে ডলফিনদের চিড়িয়াখানা বানানো হয়! ওই দ্যাখো সেই ধেড়ে খোকাখুকুদের!

ডাঙার কাছাকাছি গিয়েও মোড় নিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মত আবার সমুদ্রের দিকেই ফিরে গেল উড়ন্ত গোলক। এবার আরও উঁচু দিয়ে মেঘলোক তছনছ করে অব্যাহত রইল তার প্রভঞ্জন গতি।

কানের কাছে গুঞ্জরিত হল আবাব সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—কিগো দীননাথবাবু? কি রকম দেখলে?'

বোবা হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। পড়েছি যবনের হাতে···

খাদে নেমে এল প্রহেলিকা-স্বর—জানো ওরা কি বলছে? ফ্লাইং সসার! ফ্লাইং সসার! হাঃ হাঃ হাঃ! নির্বোধ! উজবুক! অন্যগ্রহের সসার এটা নয়—এই পৃথিবীরই জঠর থেকে এসেছে—ফিরে যাবে সেইখানেই—তার আগে তোমাকে দেখিয়ে দেব আমার ক্ষমতার আরও একটু নমুনা—'

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তার বর্ণনা দেব কি ভাষায় ভেবে পাচ্ছি না!

ছয় ঃ পৃথিবীর প্রেসার কুকার

কানের কাছে মন্ত্রধ্বনির মত গুঞ্জরণ চলেছিল অবিরাম—প্রফেসর মশাই জানেন, তুমি তাঁর চ্যালা হয়েও যা জানো না—তা হল এই ঃ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত চারটে শক্তির খবর রেখেছেন বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক, দুর্বল আর প্রবল পারমাণবিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ। নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইনের তত্ত্ব নতুন করে লেখার দরকার হয়ে পড়েছে। কেননা, ফিফথ ফোর্স বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে পৃথিবীতে। নাম তার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি। বিপরীত মহাকর্ষ বললে নিশ্চয় ভাল করে বুঝবে, তাই না মাস্টার দীননাথ?'

আর মাস্টার দীননাথ! সে তখন হতভম্ব হয়ে দেখছে উড়ুক্কু গোলক হঠাৎ পাগলা হয়ে গেল নাকি? পৃথিবী ছেড়ে পৃথিবীর বাইরে ছুটে যাচ্ছে কেন এমন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত? এভাবে তো যায় মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার রকেটগুলো! সেসব রকেটে থাকে জ্বালানির ধোঁয়া, আর প্রচণ্ড গর্জন।

কিন্তু আজব এই গোলক নিঃশব্দে অথচ অকল্পনীয় বেগে সটান পৃথিবীকে পেছনে ফেলে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে। সবুজ গ্রহের পাহাড়-বনানী-সমুদ্র ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথমটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করেছিলাম সর্বাঙ্গে—কিন্তু ছবিতে যে রকম দেখেছি বা শুনেছি, সেরকম মারাত্মক নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাল্কা তুলোর মত লাগল নিজেকে। ভেসেও উঠলাম শূন্যে। প্রফেসরকেও দেখলাম শূন্যে ভাসতে। পরক্ষণেই দুজনেই ভারি হয়ে গিয়ে চেপে বসলাম মেঝেতে।

গভীর শ্বাস নিয়ে ক্লিষ্ট হেসে প্রফেসর বললেন—'বাতাসে অক্সিজেনেরও অভাব নেই দেখছি।'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বললে—'এ ধরনের মহাকাশযান আপনার সতীর্থ বৈজ্ঞানিকরা কি এখনও কল্পনা করতে পেরেছেন, প্রফেসর?'

'না।'

জল-স্থল-অন্তরীক্ষ—সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করছে এই গোলক শুধু অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ফোর্সকে কাজে লাগাতে পারছে বলে। যাক সে কথা। পৃথিবীকে পাক দিচ্ছেন এখন—চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। দেখে নিন আপনাদের সাধের পৃথিবীর কি হাল আমি করতে পারি।

এবং দেখলাম সেই গাঁ-কাপানো দৃশ্য। দেখলাম এবং ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলাম।

পোর্টহোলগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুন্দর সবুজ পৃথিবীকে। এত ঝুটঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর ম্যাপটাকেও ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। মহাদেশ, মহাসমুদ্র গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তাই সঠিক বলতে পারব না কোন্ কোন্ অঞ্চলে দেখেছিলাম অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো।

নীল সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ উত্তাল হয়ে উঠেছিল জলরাশি। পর্বতসমান ঢেউয়ের আকারে ধেয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল দ্বীপের পর দ্বীপ। আচম্বিতে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—তুবড়ির মত ধোঁয়া, আগুন আর পাথর ছুঁড়ে দিয়েছিল অনেক উঁচুতে—লাভা গড়িয়ে পড়েছিল গা বেয়ে—ধ্বংস হয়েছিল বিস্তীর্ণ জনপদ। মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু হয়েছিল অকস্মাৎ এবং বিরাট অঞ্চল ভেঙে গিয়ে ধেয়ে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে—অন্য মহাদেশের দিকে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে হেসে বলেছিল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—'মাইডিয়ার প্রফেসর, বলুন তো আমার অঙ্গুলি হেলনে কিভাবে পৃথিবীময় এই বিপর্যয়?'

চোয়াল শক্ত করে বলেছিলেন প্রফেসর—'পৃথিবীর কেন্দ্র সূর্যপৃষ্ঠের চাইতে বেশি গরম বলে।'

বিরাট হাসি হেসে বললে রহস্যময় কণ্ঠস্বর—'অর্থাৎ আপনি জানেন অনেক, বোঝেন অনেক। সেইজন্যেই তো আপনাকে চ্যাংদোলা করে আনবার হুকুম দিয়েছিলাম নাম্বার ওয়ান সুপারকমপিউটারকে।'

পৃথিবীর বুকে বিরামহীন ধ্বংস দৃশ্য দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়েছিলাম। কিন্তু 'চ্যাংদোলা' শব্দটা শুনেই জ্বলে উঠলাম তেলেবেগুনে।

'পিণ্ডি চটকে ছাড়তাম চ্যাংদোলা করতে গেলে—'

'পিণ্ডি আমরাই চটকাবো তোমাদের।' কর্কশ হয়ে ওঠে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—'দেখতে পাচ্ছো না অ্যাটম-বুলেট পৃথিবীর প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে কিভাবে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাচ্ছি সমুদ্রের তলায় ও ডাঙায়? জল ঠেলে উঠছে, পাহাড়ের চুড়ো উড়ে যাচ্ছে, বরফ গলে ভেসে যাচ্ছে।'

'পৃথিবীর প্রেসার কুকার!' হাঁ হয়ে গেলাম আমি। প্রফেসর তাড়াতাড়ি বললেন—'অত বড় হাঁ করো না দীননাথ। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ ম্যান্টল আর বাইরের অন্তস্তল অর্থাৎ—outer core-এর মাঝের বাউণ্ডারি প্রেসার কুকারের কাজ করছে। মাঝে মাঝে বাড়তি চাপ আর উত্তাপ বেরিয়ে যায় বলেই মহাদেশগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠে সরে সরে যাচ্ছে।'

'এবং এই চাপ আর উত্তাপকে নানা ফুটো দিয়ে বার করিয়ে দিয়ে ঘটাচ্ছি এই অগ্ন্যুৎপাত,'—নির্মম স্বরে বললে অদৃশ্য সত্তা।

'কেন?' চড়া গলা আমার।

'প্রফেসর জানেন কেন। অপটিক্যাল সুপার কমপিউটার মাথার মধ্যে লাল রশ্মি দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে জবাবটা। প্রফেসর, আপনিই বলুন না।'

জবাবটা দিতে গিয়ে কি রকম যেন হয়ে গেল প্রফেসরের

মুখটা—'দীননাথ, পৃথিবীর জঠরের টেম্পারেচার এমনিতেই সূর্যপৃষ্ঠের চাইতে বেশি। দিন কয়েক হল জনাকয়েক বৈজ্ঞানিক তা ধরতে পেরেছেন। কিন্তু এই মক্কেল অনেক আগে থেকেই তা জানে। পাওয়ারফুল কামান দিয়ে অ্যাটম-বুলেট সেখানে পাঠায়। ইচ্ছে করলে পৃথিবীটাকে ভেতর থেকে বোমার মত ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।'

'কিন্তু কেন প্রফেসর? কেন?' আকুল স্বরে বলেছিলাম আমি।

ডলফিনদের ওপর অত্যাচার চলছে বলে পৃথিবী উড়িয়ে দেওয়া হবে?'

প্রশ্নের জবাব পেলাম না। ঘুম আসছিল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাত : ব্যাকটিরিয়া ব্রেন

ঘুম ভাঙবার পর দেখলাম গোলকের মধ্যেই শুয়ে রয়েছি আমি আর প্রফেসর।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক-চোখ-খসে পড়া একটা পিশাচমূর্তি। তার বাঁ দিকের গালের মাংস নেই। দাঁত দেখা যাচ্ছে মুখের ভেতরে।

আঁৎকে উঠতেই সে বললে ইয়াঙ্কি ইংরেজীতে—'বন্ধু, আমি ভূত নই। মানুষ।'

'কিন্তু এ হাল হল কি করে আপনার?'

'কস্টিক পটাশ দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে। আমার ডলফিনারিয়ামে একটা ডলফিনের চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল খেলা দেখাতে গিয়ে। তাই এই শাস্তি।'

'আপনাকে পেল কোত্থেকে?'

বিকট দাঁত বার করে হাসল আগন্তুক—নিরর্থক প্রশ্ন। 'আমার মত অনেককেই এরা ধরে এনেছে এই পাতাল-পুরীতে। সারাসোট উপসাগরের লোকই আছে বেশি।'

'কি অপরাধে?'

'ইনটেলিজেন্ট ডলফিনদের বন্ধ জায়গায় রেখে দু-পয়সা রোজগার করছিল বলে।'

'ডলফিনরা ইনটেলিজেন্ট তো এই হেঁড়ে-গলা লোকটার গায়ে ফোস্কা পড়ছে কেন?'

ভৌতিক মূর্তি এক চোখ মেলে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে—'লোক নয়—একটা ব্রেন!'

'ব্রেন!'

'ব্যাকটিরিয়া কোষ দিয়ে তৈরি ব্রেন। সুপার কম্পিউটার নাম্বার থ্রি।'

'কি বলছেন মাথায় ঢুকছে না। কে তৈরি করল এই ব্রেন?'

'ডলফিনরা।'

'অসম্ভব।'

অসম্ভব বলে পৃথিবীতে এখন আর কিছু নেই। সুপার ডলফিনদের তৈরি করেছি তো আমরাই।'

'সুপার ডলফিন!'

'পারমাণবিক বিস্ফোরণের মহড়া চলেছে পৃথিবী জুড়ে বছরের পর বছর। ফ্লোরিডার দিকে পারমাণবিক ভস্ম এসেছিল বহু বছর আগে—মিউটেসন ঘটেছিল বেশ কিছু ডলফিনের কোষে।'

আবার সরব হল অদৃশ্য সত্তা—'আমিই সেই ব্যাকটিরিয়া ব্রেন। এই পাতালপুরীর মাস্টার ইউনিট আমি। আমিই এই পৃথিবীর এমন এক সুপার কম্পিউটার যার চিন্তার গতি মানুষের চিন্তার গতির মত সেকেণ্ডে একশ ফুট নয়। আলোর গতিবেগ ভাবি আমি। সাধারণ কম্পিউটার একটার পর একটা সমস্যার সমাধান করে। আমি করি একই সঙ্গে অজস্র—ঠিক মানুষের ব্রেনের মত। কিন্তু মানুষের ব্রেনের কোষগুলো গায়ে গায়ে লাগানো থাকে—নিজেরা নড়াচড়া করতে পারে না—আমার জীবাণু কোষেরা নড়ে চড়ে সমাধানের গতিবেগ এমন বাড়িয়ে দিয়েছে যা অতিমানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। আমিই এখন এই পৃথিবীর চরম শক্তি—আমাকে টেক্কা দিক সামান্য মানুষ—আমি তা চাই না।'

'মানুষের বয়ে গেছে টেক্কা দিতে। তাদের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—' রেগে মেগে আরও কিছু বলতাম, কিন্তু মুখে হাতচাপা দিলেন প্রফেসর।'

বললেন—"দীননাথ, সেই চেষ্টাই চলছে কিছু গবেষণাগারে। এবং এই গবেষণা যাতে আর না চলে, তাই ধরে আনা হয়েছে আমাদের।"

'আপনি বললেই বন্ধ হবে?'

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?'

চোখ মুখ লাল হয়ে গেল প্রচণ্ড রাগে—'প্রফেসর, আপনি এত কাওয়ার্ড? প্রাণের ভয়ে গবেষণায় বাগড়া দেবেন?'

প্রফেসর আমতা আমতা করে কি বলতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই দপ্ করে নিভে গেল গোলকের আলো। বিকট একটা হাসি শুনলাম এবং পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত হল একটা সবুজাভ মূর্তি।

সেই অমানুষ—যার দুটো চোখ আমি উপড়ে নিয়েছিলাম। এখন তার সারা গা থেকে সবুজ রশ্মি ছিটকে বেরোচ্ছে। চোখ গন্‌গনে। আমি তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। ফের জ্ঞান হারালাম।

আট : ঘামের বিষ

জ্ঞান টনটনে হতেই দেখলাম আমি আর সেই অমানুষ পাশাপাশি সাঁতার কাটছি ঠিক ডুবুরির মত। আমার মুখে ডুবুরির মুখোশ। দূরে দূরে আরও অমানুষদের দেখা

যাচ্ছে। মাছের মত পিঠের জেট চালিয়ে জলের তলদেশে ছুটোছুটি করছে।

দারুণ কর্মব্যস্ত প্রত্যেকেই। জলতল আলোয় আলোময়। বিশাল কয়েকটা ডলফিন রাজকীয় চালে যাতায়াত করছে। আশেপাশে।

আমাদের সামনেই এসে গেল একটা ডলফিন। সাধারণ ডলফিন বড় জোর ন-দশ ফুট লম্বা হয় শুনেছি। এর আকার কিন্তু বিশাল। পঞ্চাশ ফুট তো বটেই। ছোটখাট তিমি বললেও চলে।

আমার মগজে কোনও সাড় নেই। নেই বলেই এতক্ষণ সাঁতরেছি—অথচ নিজেও তা জানি না। বিশালকায় এই ডলফিনের সামনে এসেও নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে রইলাম।

ডলফিনের দুই চোখে দেখলাম সুগভীর দূরায়ত বুদ্ধি-দীপ্ত চাহনি। যেন ধ্যানস্থ ঋষি।

মস্তিষ্কের মধ্যে ধ্বনিত হল যেন দৈববাণী—'দীননাথ, তুমি যার চোখ খুবলে নিয়েছিলে, তার চোখ বসাতে গিয়েই একটা মহাবিপদ থেকে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করেছি। তুমি জানো তোমাদের আনা হয়েছে জীবাণু সুপার কমপিউটারের গবেষণা যাতে বন্ধ থাকে পৃথিবীতে—এই জন্যে। তাই না?'

'হ্যাঁ', মুখোশের মধ্যেই বললাম আমি।

'আমাদের হাতে গড়া জীবাণু সুপারকমপিউটারকে এই আদেশ না দিলে তোমাদের এখানে আনাই হত না। আসলে আমরা চাই এর প্রতাপ কমাতে।'

'মানে?'

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দানবের মত আমরা এই দানব তৈরি করে ফেলেছি আমাদের অতি মগজ দিয়ে। একে আর বাড়তে দিলে এ পৃথিবীকে ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবে—প্রাণের চিহ্ন মুছে দেবে।'

'নিজেও তো শেষ হয়ে যাবে।'

'তার আগে নিজে চলে যাবে অন্য গ্রহে। ক্ষমতা এর অসীম—গতি এর সর্বত্র—শুধু এখানে ছাড়া—আমাদের এই অঞ্চলে তার কোনও জারিজুরি খাটে না—এখানকার কোনও খবর সে পায় না—এখানকার জলে তার শক্তি ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়—তাই তোমাকে শাস্তি দেওয়ার অছিলায় আনিয়েছি এখানে।'

'কিন্তু কেন? সামান্য মানুষ আমি—'

'অসামান্য ছোট্ট একটা কারণে। অসম্ভব নোংরা তুমি।'

'কী'—

'শোনো। তোমার দেহের রক্ত পরিষ্কার নয়, স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলো না বলে। ফলে এমন একটা ভাইরাস আশ্রয় নিয়েছে তোমার রক্তে যে তোমাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে, অথচ তোমার ক্ষতি করছে না—এমন অনুকূল পরিবেশ আর উপাদেয় রক্ত আর কোথাও পাবে না বলে—'

'ননসেন্স!'

'গালাগাল দিও না। তোমার হাতের ঘামেও থাকে সেই ভাইরাস। ভয়ের চোটে ঘেমে গিয়ে তারপর রেগেমেগে চোখ খুবলে নিয়েছিলে। ঘাম লেগেছিল উপড়োনো চোখে। আমাদের টেস্ট রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই ঘামেই রয়েছে বিভীষণ ব্যাকটিরিয়া-ব্রেনের মৃত্যুদূত।'

'বিভীষণ কেন?'

'রামায়ণে বিভীষণের যা ভূমিকা, আমাদের ব্যাকটিরিয়া ব্রেনও যে তাই করে চলেছে। ঘরশত্রু বিভীষণ নাম্বার ওয়ান। যন্ত্র যাতে স্রষ্টাকে শাসন-দমন করতে না পারে, তার জন্যে আগে থেকেই হুঁশিয়ার ছিলাম, ব্যবস্থাও নিয়ে ছিলাম—তাই সে আমাদের ঘাঁটাতে পারে না। কিন্তু প্রাণ জিনিসটাকে একদম সইতে পারে না—স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যেতে কে না চায়?'

'বিশ্বাসঘাতক!'

'তা তো বটেই। দীননাথ, তোমার পাশেই যে সুপার কমপিউটার রয়েছে, তারও ব্রেন এখন বিকল রয়েছে—ব্যাকটিরিয়া-ব্রেন তার ব্রেন থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে আর প্রফেসরকে কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে দীঘায়। তোমার সঙ্গে যে কথা হল, তা এখন চেপে যাও—প্রফেসরও যেন জানতে না পারেন। উনি কথা দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকদের বলবেন, ব্যাকটিরিয়া—ব্রেন গবেষণা যেন অচিরে বন্ধ করা হয়—নইলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।'

'বেশ!'

'ডাঙায় ফিরে গিয়ে তোমার রক্ত থেকে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে বলবে প্রফেসরকে। এই ভাইরাস থেকেই তৈরি হবে আর একটা সাব-ভাইরাস—আমাদের তৈরি ব্রেনের ব্যাকটিরিয়াদের যম। বুঝেছো?'

'বুঝেছি।'

প্রফেসর আর আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেঁটে এসে-ছিলাম দীঘার বালি মাড়িয়ে—কিভাবে জল থেকে উঠে এসেছিলাম, তা মনে নেই।

প্রফেসরকে যথাসময়ে বলেছিলাম আমার রক্ত নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু ভদ্রলোক আমার নোংরামি নিয়ে এমন টিটকিরি দিতে আরম্ভ করেছেন যে আদৌ রক্ত দেব কি না ভাবছি।

তোমরা অনুরোধ করলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তার আগে বলতে হবে, ভাইরাস শব্দটির মানে কী?*

---

* 'ভাইরাস' একটা ল্যাটিন শব্দ। মানে, বিষ।
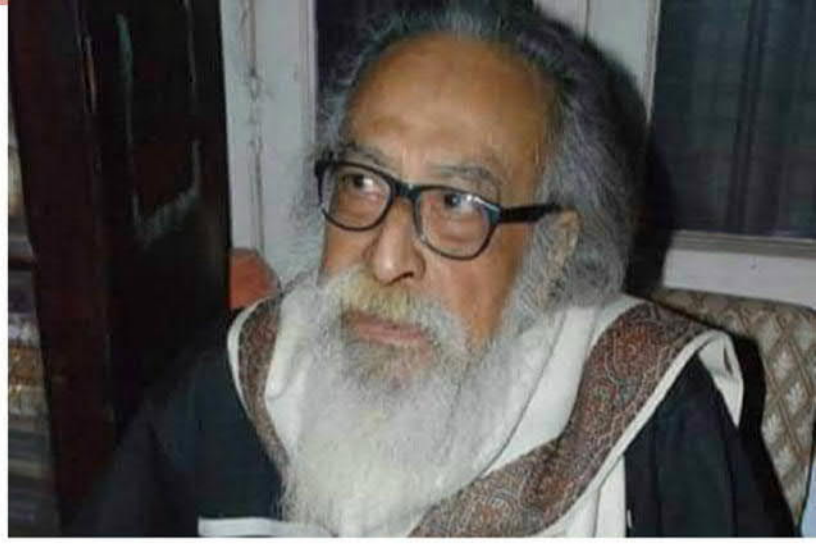
'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধটার স্রষ্টাও তিনি। শুধু সাহিত্যের আকারে বাঙালিকে কল্পবিজ্ঞান পড়তে শেখানোই নয়, তিনি বাঙালি পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সোমবার গভীর রাতে প্রয়াত হলেন অদ্রীশ বর্ধন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বস্তুত বাংলাতেও যে বিজ্ঞানচর্চা হতে পারে কিংবা বিজ্ঞানে বাংলার অবদানের কথা বারবার তাঁর কলমে উঠে এসেছে। অদ্রীশ বর্ধনের লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, বহু কঠিনতম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেও তিনি সাহিত্যগুণের মাধ্যমে অত্যন্ত সরল, সহজ করে তুলতেন পাঠকদের কাছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তো বটেই, অদ্রীশ বর্ধন জন্ম দিয়েছিলেন কত সব মায়াবী চরিত্রের। ফাদার ঘনশ্যাম, জিরো গজানন, চাণক্য চাকলা, নারায়ণী ও ইন্দ্রনাথ রুদ্রর মতো চরিত্র বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল হটকেক।

কল্পবিজ্ঞান নিয়েই তাঁর কার্যকলাপ মূলত ঘোরাফেরা করলেও অদ্রীশ বর্ধন কিন্তু গোয়েন্দা চরিত্রও নির্মাণ করেছেন একের পর এক। ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়াও অনুবাদ করেছেন বহু বিদেশী সাহিত্যও।